ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৌষ ১৪২৬

তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসে প্রান্তজন, সমাজ ও সংস্কৃতি

*মোহাম্মদ আব্দুর রউফ

সারসংক্ষেপ: অদ্বৈত মল্লবর্মণ (১৯১৪-১৯৫১) মূলত কথাসাহিত্যিক। তিনি বেশকিছু গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন। তন্মধ্যে *তিতাস একটি নদীর নাম*(১৩৬৩) তাঁর অমর সৃষ্টিকর্ম। গ্রন্থটির কল্যাণে গ্রন্থস্রষ্টা অদ্বৈত মল্লবর্মণও পাঠকের কাছে অমর হয়ে আছেন। দেশ-বিদেশে নদীকেন্দ্রিক অনেক উপন্যাসই দেখা যায়। তন্মধ্যে *তিতাস একটি নদীর নাম* একটি অন্যতম উপন্যাস। তিতাস নদীর তীরবর্তী মালোপাড়া এ উপন্যাসের পটভূমি। এ পাড়াতেই লেখক জন্মেছেন, বেড়ে উঠেছেন। তাই জীবনাভিজ্ঞতাই এই শিল্পকর্ম নির্মাণে সঞ্জীবনী–শক্তিরূপে ক্রিয়াশীল থেকেছে। *তিতাস একটি নদীর নাম* একটি আঞ্চলিক উপন্যাস। তিতাসকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে দুপাড়ে জনবসতি, গড়ে ওঠে মালোপাড়া। এই মালোপাড়া মানুষের জীনালেখ্য রূপায়ণই লেখকের অন্বিষ্ট। সময়, সমাজ, মানুষ, মানুষের যাপিত জীবনাচার, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ব্যথা-বেদনা ইত্যাকার বহুমাত্রিক জীবনঘনিষ্ঠ প্রসঙ্গগুলো এই উপন্যাসে লক্ষ করা যায়। এ উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্রই প্রান্তিক মানুষ। প্রান্তিক হলেও তারা সমাজবদ্ধভাবেই বাস করে। আলোচ্য প্রবন্ধে *তিতাস একটি নদীর নাম* উপন্যাসে প্রান্তজনের জীবন, সমাজ ও সংস্কৃতির স্বরূপসন্ধান লক্ষ করা হয়েছে।

এক. ভূমিকা

অদ্বৈত মল্লবর্মণ পেশায় সাংবাদিক ছিলেন। তাঁর জীবনকাল মাত্র সাঁইত্রিশ বছরে সীমাবদ্ধ। তাই বেশিদিন লেখার সুযোগ তিনি পাননি। যেটুকু পেয়েছেন সেটুকু কাজে লাগিয়েছেন ষোলো আনা। তার লেখাতে গভীর দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, তিনি কল্পনায় বিশ্বাসী নন, বরং জীবন-বাস্তবতাকেই পুঁজি করে তাঁর শিল্পের সংসার সাজিয়েছেন। অন্তত *তিতাস একটি নদীর নাম* উপন্যাসটি তাই বলে। উপন্যাসটি কিস্তি আকারে বিভিন্ন সময়ে মাসিক *মোহাম্মদী* পত্রিকায় বের হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় কোন কোন শিরোনামে লেখক কিছুটা পরিবর্তন আনেন। উপন্যাসবয়ানকে তিনি চারটি পর্বে বিন্যস্ত করেছেন এবং এগুলো সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করেছেন। যেমন: এক. তিতাস একটি নদীর নাম, প্রবাস খণ্ড; দুই. নয়া বসত, জন্ম মৃত্যু বিবাহ; তিন. রামধনু, রাঙা নাও; চার. দুরঙা প্রজাপতি, ভাসমান। এভাবে প্রত্যেকটিতে দুটি করে উপপর্ব রয়েছে। এই আটটি উপপর্বে তিনি মালোপাড়ার মালোদের জীবনবৃত্তান্ত শিল্পকাঠামোতে লিপিবদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

তিতাসের নামে লেখক এ উপন্যাসের নামকরণ করেছেন। তাই বলে তিতাসের গল্পকাহিনি লেখকের অন্বিষ্ট নয়। আর দশটি নদীর মতো তিতাসের কোনো কাহিনি নেই। এটি একটি সাধারণ নদী। নদীটি প্রসঙ্গে লেখক বলছেন-

> তিতাস শাহী মেজাজে চলে। তার সাপের মত বক্রতা নাই, কৃপণের মত কুটিলতা নাই। কৃষ্ণপক্ষের ভাটায় তার বুকের খানিকটা শুষিয়া নেয়, কিন্তু কাঙ্গাল করে না। শুক্লপক্ষের জোয়ারের উদ্দীপনা তাকে ফোলায়, কিন্তু উদ্বেল করে না।[১]

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা।

এই তো তিতাস নদী। কিন্তু নদীর বর্ণনা লেখকের উদ্দেশ্য নয়। লেখকের উদ্দেশ্য মানুষ, নদীপাড়ের মানুষ। নদীকে কেন্দ্র করে দুপারে জনবসতি গড়ে উঠেছে। নদীকে নিয়েই তাদের জীবনজীবিকা চলে। নদী নিয়েই তাদের সুখ, নদী নিয়েই তাদের দুঃখ। নদীই দুপারের মানুষের মাঝে সংযোগসেতু হিসেবে বিবেচিত। নদীর তীরে কিছু আবাদি জমি আছে। কিছু মানুষ কৃষিকাজও করে। তবে এদের কথা উপন্যাসে কমই এসেছে। লেখকের উদ্দেশ্য নদীতীরের মালোপাড়ার মালো সম্প্রদায়ের জীবনসংগ্রামের করুণাল্লেখ্য। এদের জীবন তিতাসকে কেন্দ্র করেই পুরুষানুক্রমে আবর্তিত। ঔপন্যাসিক বলেন–

> ছেলেমেয়ে বুড়ো-বুড়িরা পর্যন্ত একখানা বাঁশে হাত রাখিয়া আর একখানা বাঁশে পা টিপিয়া টিপিয়া পার হইয়া যায়। ছেলে কোলে নারীরাও যাইতে পারে। নৌকাগুলি অচল হয়। মাঝিরা কোমরে দড়ি বাঁধিয়া সেগুলিকে টানিয়া নেয়। এপারে ওপারে ক্ষেত। চাষীরা দিনের রোদে তাতিয়া কাজ করে। এপারের চাষী ওপারের জনকে ডাকিয়া ঘরের খবর জিজ্ঞাসা করে। ওপারের চাষী ঘাম মুছিয়া জবাব দেয়। গরুগুলি নামিয়া স্নান করিতে চেষ্টা করে। অবগাহন স্নান। কিন্তু গা ডোবে না। কাক-স্নান করা মাত্র সম্ভব হয় কোন রকমে। নারীরা কোমরজলে গা ডুবাইবার চেষ্টায় উবু হইয়া দুই হাতে ঢেউ তুলিয়া নীচু করা ঘাড়ে-পিঠে জল দিয়া স্নানের কাজ শেষ করে। শিশুদের ডুবিবার ভয় নাই বলিয়া মায়েরা তাদের জলে ছাড়িয়া দিয়াও নিরুদ্বেগে বাসন মাজে, কাপড় কাচে, আর এক পয়সা দামের কার্বলিক সাবানে পা ঘষে। অল্পদূরে ঘর। পুরুষমানুষে ডাক দিলে এখান হইতে শোনা যাইবে: তাই ব্যস্ততা নাই।[২]

নদীর সঙ্গে মালোপাড়ার মালোরা কতটা গভীরভাবে সম্পৃক্ত সে বিষয়টিই ঔপন্যাসিক এখানে উল্লেখ করতে চেয়েছেন।

দুই. প্রান্তজনের জীবনচরিত্রচিত্রণ

চরিত্রের মাধ্যমেই উপন্যাসবয়ান শিল্পসার্থকতার দিকে এগিয়ে যায়। এই উপন্যাসের চরিত্রসংখ্যা কম নয় এবং সব চরিত্রই কোনো না কোনোভাবে তিতাসের সঙ্গে সম্পর্কিত। এবং সব চরিত্রই প্রান্তবাসী, নিচুতলার মানুষ। নদীকে কেন্দ্র করেই তাদের জীবনজীবিকা সচল থাকে। যেমন কিশোর, সুবল, বাসন্তী, অনন্ত, অনন্তের মা, অনন্তবালা, রামকেশব, বাঁশিরাম মোড়ল, মোড়ল-গিন্নি, বলরাম, গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দদা, বোধাই মালো, ছমির, জমিলা, করম আলী, বন্দে আলী, দীননাথ মালো, গগন মালো, তিলকচাঁদ, বেদেনী, রামপ্রসাদ, বাহারুল্লাহ, কাদির, মোক্তার, গফুর, খুশী, রসু, বনমালি, উদয়তারা, আসমানতারা, নয়নতারা, উদয়চাঁদ, ময়না, লবচন্দ্র, বুরুজ ঠাকুর, ছাদির, রমু, কালোবরণ, রামদয়াল, গুরুদয়াল, তামসীর বাপ, ভূইমালি, ভূইমালির মেয়ে, গৌরকিশোর প্রমুখ। এখানে অপ্রধান চরিত্রই সংখ্যায় বেশি। ক্ষণিকের জন্য কিছুকিছু চরিত্র উপস্থিত হলেও নিচুতলার মানুষের দহনযন্ত্রণা উপস্থাপনের জন্য এদের উপস্থিতি অনস্বীকার্য। এদের অধিকাংশই মালোপাড়ার বাসিন্দা। প্রায় সবাই মাছ ধরে, মাছ বেচে বেঁচে থাকে।

দুঃখ মালোদের নিত্যসঙ্গী। তারা প্রতিটি দিন সংগ্রাম করে বেঁচে থাকে। সংগ্রাম করে ভাগ্যের সঙ্গে, দুঃখের সঙ্গে; প্রতিদিন খাবার সংগ্রহের সংগ্রাম, প্রতিদিন বেঁচে থাকার সংগ্রাম। খাবার সংগ্রহের একমাত্র উপায় তিতাসে মাছ ধরা এবং বিক্রি করা। এই তিতাসের

জলটুকুই মালোদের। এরা জলের মালিক, জমির নয়। সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের একমাত্র চাওয়া একটি জাল ও নৌকার মালিক হওয়া। এর অর্থ হচ্ছে এসব মালোদের জালও নেই, নৌকাও নেই। অথচ তারা জেলে সম্প্রদায়। অর্থাৎ এরা অন্যের নৌকায় মাছ ধরার কাজ করে। এই অভাব-অনটন তারা পুরুষানুক্রমেই পেয়েছে। অর্থাৎ পুরুষানুক্রমেই তারা কষ্ট চেপে বাঁচার সংগ্রামে জড়িয়ে আছে।

বিয়ের সময়ে মালোদের জাল ও নৌকা আছে কিনা যাচাই করে দেখা হয়। জাল ও নৌকার মতো দুটি বস্তু থাকলে সেই মালোকে সচ্ছল বলে মনে করা হয়। নিশ্চিতে কন্যা সম্প্রদায় করা যায়। এমনকি কেউ কেউ ভবিষ্যতে জাল ও নৌকা করবে বলে হবু শ্বশুরকে আশ্বাস দিয়ে বিয়ে করে। কিন্তু সমগ্র জীবনসংগ্রাম করেও একটি জাল ও নৌকার মালিক হতে পারে না। গগন মালো এমনই একজন হতভাগ্য মানুষ। খোঁচা দিয়ে বউ এখনও তাকে সেই কথাটি স্মরণ করিয়ে দেয়।

> এমন টুলাইন্যা গিরস্তি কত দিন চালাইবা! নাও করবা, জাল করবা, সাউকারি কইরা সংসার চালাইবা! এই কথা আমার বাপের কাছে তিন সত্য কইরা তবে ত আমারে বিয়া করতে পারছ। স্মরণ হয় না কেনে?[৩]

গগনচন্দ্র মালো এমনই হতভাগ্য দরিদ্র যে সারা জীবনে একটি নৌকার মালিক হতে পারেনি। অন্যের নৌকায় মাছ ধরে জীবন কাটিয়ে দেয়। নিজে না পারলেও ছেলে সুবল পারবে–এমনই বাসনা গগনমালো বুকে লালনপালন করে। তাই বউয়ের খোঁচার জবাবে গগনমালো জানায়-আমি ত করতাম পারলাম না, নাও জাল আমার সুবলে করব। অত ভেনভেন করিস না।[৪] এভাবে দারিদ্র্যতা এক পুরুষ থেকে আরেক পুরুষে উত্তরাধিকাররূপে পৌঁছে। গগনচন্দ্র মালোর দারিদ্র সুবলও সারাজীবন বহন করে। অল্পবয়সে বন্ধু কিশোরের নৌকায় কাজ করে। জীবনের ঝুঁকি নিয়েও এরা কাজ করে। লেখকের ভাষায়–

> শৈশবে দুইজনে বর্ষাকালে সাপেভরা বটের ঝুড়িতে বসিয়া খোপের মধ্য দিয়া বড়শি ফেলিত। শিং মাছের জাল বুনিয়া আঁধার রাতে বুকজল ভরা পাট ক্ষেতের আল ধরিয়া অনেক দূরে গিয়া পাতিয়া আসিত। রাত থাকিতে উঠিয়া শিং মাছ–কৈ মাছ গাঁথা জাল তুলিয়া আনিত। এসব জালে অনেক সময় সাপ গাঁথা পড়ে। কিন্তু মালোর ছেলেরা তাতে ভয় পায় না। অনেক মালোর ছেলে এভাবে মারা পড়ে দেখিয়াও ভয় পায় না। কেননা অনেক মরিয়া গিয়াও তারা অনেক বাঁচিয়া থাকে।[৫]

এভাবেই সুবলরা বেঁচে থাকে। নিত্যদিনের অভাব-অনটন আর বেদনার সঙ্গে মিতালি করে সুবলরা বেঁচে থাকে। 'জন্ম মৃত্যু বিবাহ' পর্বে এসে বাসন্তীর সঙ্গে সুবলের বিয়ে হয়। কিন্তু বেশিদিন সংসার করতে পারে নি। দিন আনা দিন খাওয়া মানুষের বসে থাকার উপায় নেই। সুবল বাসন্তীর নিষেধ অমান্য করে কালোবরণ ব্যাপারীর নৌকায় কাজ করতে যায়। আর সেখানেই সুবলের জীবনের করুণ পরিসমাপ্তি ঘটে। লেখক বর্ণনায়–

> মেঘনা নদীর মাঝখান দিয়া কালোবরণ বেপারীর নৌকা চলিতেছিল। এমন সময় আসিল তুফান। ঈশানকোণের বাতাস নৌকাটাকে ঝাঁটাইয়া তীরের দিকে নিয়া চলিল। সকলে প্রস্তুত হইল তীরে ধাক্কা লাগিবার আগেই তারা লাফাইয়া নামিয়া পড়িবে এবং একযোগে ঠেলিয়া নৌকার গতিবেগ কমাইয়া আসন্ন দুর্ঘটনা নিবারণ করিবে। আগে সুবলের উপর আদেশ হইল, শীঘ্র লগি হাতে লাফাইয়া তীরে গিয়া পড়, পড়িয়া লগি ঠেকাইয়া

> নৌকাটাকে বাঁচা। তোর সঙ্গে আমরাও লাফ দিতেছি। বেতনধারী লোকের মনে মুনিবের প্রতি প্রবল একটা বাধ্যবাধকতা বোধ থাকে। তাই সুবল ফলাফল না ভাবিয়া মালিকের আদেশ মত লাফাইয়া তীরে নামিল কিন্তু আর কেউ ভয়ে নামিল না। সুবল লগিটার গোড়াটা নৌকারদিকে ছুড়িয়া, মাঝখানটাতে কাঁধ লাগাইতে গেল, তাহাতে নৌকার বেগ যদি একটু কমে। বেগ কমিল না। ঢালু তীর। সবেগে নৌকা তীরে উঠিয়া আসিল। সুবল নৌকার তলায় চাপা পড়িল, আর উঠিল না।[৬]

এভাবে সুবলের করুণ মৃত্যু হয়, বাসন্তী বিধবা হয়। সুবলের বাবা গগনচন্দ্র মালো চেয়েছিল সুবল নৌকা করবে। কিন্তু সুবল নিজের নৌকা করতে পারেনি। অন্যের নৌকায় খাটতে গিয়ে অকালে করুণভাবে জীবনটা হারায়। স্ত্রী বাসন্তীর জীবনে নেমে আসে বৈধব্যের করুণ যন্ত্রণা। মালোজীবনে দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটে না। জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটলেও দুঃখটা প্রবহমান থেকে যায় বংশপরম্পরায়।

এই বাসন্তীদের দুঃখকষ্ট কোনদিনই শেষ হয় না। বাসন্তীর ভাই নেই, বোন নেই। সে বাবা-মায়ের একমাত্র কন্যাসন্তান। তবু বাবা দীননাথ মালো এতই দীন যে বাসন্তীর সুখ-দুঃখের খোঁজখবর নেওয়ার সময় পায় না। এগার বছর বয়সে বাসন্তীর বিয়ে হয়। কয়েক বছর পরেই মনিবের আদেশ পালন করতে গিয়ে স্বামী সুবল প্রাণ হারায়। বাসন্তী আবার দীনদরিদ্র বাবা দীননাথের কাঁধে এসে পড়ে। এ সময় অনন্ত ও অনন্তর মাকে বাসন্তী বুকে ঠাঁই দিয়ে একটু স্বস্তি খুঁজে পায়। বাবামায়ের গলগ্রহ হয়েই বাসন্তীকে বাঁচতে হয়। এত দুঃখের মধ্যে থেকেই বাসন্তীর মুখে কোনো হাসি নেই। কোনো একদিন ময়লা ফেলতে গিয়ে ময়না নামক একজন পাখি শিকারির সঙ্গে এক চিলতে হেসেছিল বাসন্তী। এতেই বাসন্তীর মা বাসন্তীচরিত্রে দোষ দেখতে পায়। এবং দীননাথের কানে পৌঁছে দেয়। বাবা-মা মিলে বাসন্তীকে বকুনি দেয়। সব দুঃখকষ্ট সইতে পারলেও চরিত্র তুলে কেউ কথা বলুক- এটি বাসন্তী মানতে পারেনি। এবার বাসন্তীর মুখ খুলে যায়। বাসন্তী মনের সব দুঃখকষ্ট উগরে দেয়। এবার বাসন্তী কিছুটা বিদ্রোহের ভূমিকায়। লেখকর বর্ণনায়–

> আমি ময়নার সাথে কথা কমু, তার সাথে পুরীর বাইর হইয়া যামু। তোমরা কি করতে পার আমার। খাইতে দিবা না, খামু না, পরতে দিবা না, পরুম না। কিন্তু আমি বাইর হইয়া যামুই। তোমরার মুখে চুনকালি পড়ব, আমার কি। আমার তিনকুলে কারুরলাগি ভাবনা নাই। একলা গতর আমি লুটাইয়া দেমু, নষ্ট কইরা দেমু, যা মনে লয় তাই করুম, তোমরা কথা কইতে পারবা না। মনে কইরা দেখ কোন শিশুকালে বিয়া দিছলা। মইরা গেছে। জানলাম না কিছু, বুঝলাম না কিছু। সেই অবুঝকালে ধর্মে কাঁচারাড়ি বানাইয়া থুইছে। সেই অবধি পোড়া কপাল লইয়া বনে বনে কাইন্দা ফিরি। তোমরা ত সুখে আছ। তোমরা কি বুঝবা আমার দুঃখের গাঙ কত গহীন। আমার বুঝি সাধ আহ্লাদ নাই। আমার বুছি কিছুর দরকার হয় না।[৭]

এ উপন্যাসের আরেক হতভাগ্য চরিত্র কিশোর উজানিনগর থেকে বিয়ে করে বাড়ি ফেরে। পানিপথে ডাকাতের কবলে পড়ে নববধূ অপহরণ হয়ে যায়। স্ত্রী হারিয়ে কিশোর মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে পাগলে পরিণত হয়। রামকেশবের দুঃখ বাড়ে। বুড়াবুড়ি মিলে প্রহার করতে করতে নদীতে নিয়ে যায় স্নান করাতে। কিশোরের পাগলামির কারণে এক সময় কিশোর জনতার হাতে ভীষণ মার খায়। তিনদিন পর পরপারে পাড়ি জমায় কিশোর।

দিনকয়েকপর অনন্তর মাও পরপারে যাত্রা করে। সারাজীবন দুঃখের দহনে জ্বলতে হয় এ পাড়ার মানুষকে। এমনকি মৃত্যুর পরেও দহনেই শেষ হয় ভবলীলা। অদ্বৈত মল্লবর্মণ বলছেন-

> জন্ম মৃত্যু বিবাহ এ তিনেতেই মালোরা পয়সা খরচ করে। সে পয়সাতে কাঠ আসিল, বাঁশ আসিল, তেল ঘি আসিল, আর আসিল মাটির একটি কলসি। সমারোহ করিয়া নৌকায় তুলিয়া তারা অনন্তর মাকে পোড়াইতে লইয়া গেল।[৮]

মৃত্যুতেও মালোপাড়ার মালোদের দুঃখ ফুরায় না। সেই দুঃখ বইতে হয় পরবর্তীপ্রজন্মের কাউকে না কাউকে। কিশোরের দুঃখ অনন্তকে বইতে দেখা গেছে। অনন্তর মায়ের দুঃখ অনন্তকে বইতে হয়েছে।

অনন্ত পিতৃহীন-মাতৃহীন। বাসন্তী আশ্রয় দিলেও বাসন্তীর মা আশ্রয় দিতে চায় না। অভাবের সংসারে বাড়তি ঝামেলা। এক সময় বাসন্তীর মা আগুনসযুক্ত লাঠি দিয়ে অনন্তকে পেটায় আর বলে– "শত্তুর শত্তুর। ইটা আমার শত্তুর। অখনই মরুক। সুবচনীর পূজা করুম।"[৯] অনন্ত নিরুপায় হয়ে শেষ আশ্রয়স্থল বাসন্তীর কোল ছেড়ে এঘাটে-ওঘাটে ঘুরে বেড়ায়। এক সময় বনমালির নৌকায় ওঠে। শেষ পর্যন্ত নৌকা ও নদীই এদের আশ্রয়স্থল। অনন্ত বনমালির নৌকায় পানিতে ভেসে বেড়ায়। অনন্ত একটি নিরুপায় সহায়সম্বলহীন ভাসমান এতিম। এই অনন্তদের জীবনসংগ্রামের কাহিনি বর্ণনা করাই লেখকের অন্বিষ্ট।

মৎস্যজীবীর বাইরেও কিছু চরিত্র এ উপন্যাসে দেখা যায়। তারা প্রান্তিক চাষি। নিজের জমি নেই, অপরের জমিতে শ্রম দেয়। করম আলী আর বন্দে আলী এই প্রকৃতির দুজন মানুষ। তারা সারাদিন মহাজনের বাড়িতে শ্রম দেয়। বিশ্রামের সময় নেই। এমনকি রাতের সবটুকু আরাম করে তারা উপভোগ করতে পারে না। রাতের শেষপ্রহর শেষ না হতেই তাদেরকে বেরিয়ে পড়তে হয় মহাজন জোবেদ আলীর বাড়ির উদ্দেশ্যে। আবার প্রথম প্রহরেরও খানিকটা কাটিয়ে আসতে হয় সেখানেই।

সারাদিন মাঠে শ্রম দিয়ে সন্ধার দিকে ফিরতে হয় জোবেদ আলীর বাড়িতে। সেখানেও কত কাজ এই দুজনের জন্য অপেক্ষা করছে। সবশেষ করে তাই বাড়িতে এসে স্ত্রীকে ঘুমন্ত দেখতে পায়। এই হলো করম আলী আর বন্দে আলীর জীবন। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায়–

> পাখিরাও এ সময় নিজের বাসায় যায়। তারা যাইবে মুনিবের বাড়িতে। গিয়া গোয়ালের গরু বাঁধিবে। ঘাস কাটিবে। মাড় দিবে, খইল ভুসি দিবে। জোতদার চাষীর বাড়িতে কত কাজ। এটা সেটা টুকিটাকি কাজ করিতে করিতে হাজার গণ্ডা কাজ হইয়া যায়। প্রকাণ্ড চওড়া উঠান। চার ভিটায় বড় বড় চারিটা ঘর। বাহিরের দিকে গোয়ালসুদ্ধ আরো তিন-চারিটা ঘর। দড়ি পাকানো হইতে বেড়া বাঁধা পর্যন্ত এই এতবড় বাড়িতে কত কাজ যে এই দুইজনের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে।[১০]

করম আলী আর বন্দে আলী এভাবে জোতদারের বাড়িতে কাজ করে। তাদের মনটা পড়ে থাকে বাড়িতে। খাওয়ার সময় মনটা ব্যথায় টনটন করে। তাই একে অপরের সঙ্গে দুঃখ ভাগাভাগি করে। করম আলীকে লক্ষ করে বন্দে আলী বলে– 'ভাই করম আলী নিজে ত খাইলাম মাগুর মাছের ঝোল। আমার ঘরের মানুষের একমুঠ শাক-ভাত আজ জুটল নি, কি

জানি'?[১১] স্ত্রীর কথা মনে পড়ে বন্দে আলীর খাবার মুখে আটকে যায়, নিচে নামতে চায় না। সেই দুঃখটা যে করম আলীর নেই তা নয়। বরং করম আলী ভুলে থাকার চেষ্টা করে। এতে তার কষ্টটুকু কিছুটা হলেও কমে। বন্দে আলীর স্ত্রীও পরের বাড়িতে ধান ভানে। ধান ভানতে ভানতে হাতে কড়া পড়ে যায়। স্ত্রীর প্রতি বন্দা আলীর ভালোবাসা ও দুঃখটা লেখক উপস্থাপন করেছেন এভাবে–

> সারাদিনের মেহনতে নাস্তানাবুদ হইয়া ঘরে যাই, গিয়া দেখি ছিঁড়া চাটাইয়ে শুইয়া আছে। ঝুপ কইরা তার পাশে শুইয়া পড়ি; জাগাই না।–একদিন তার একখানা হাত আইয়া আমার বুকের উপর পইড়া যায়। হাতখানা হাতে লইয়া দেখি, কি শক্ত! কড়া পড়েছে, পরের বাড়িতে ধান ভানতে ভানতে।[১২]

করম আলীর বউ ধান ভানে না, কাঁথা সেলাই করে। ডান হাতের সুচের ফোঁড় বাম হাতে তুলতে তুলতে বাম হাতে হাজারো দাগ। এবার করম আলী বলে– 'আমি ছিঁড়া কাঁথায় গাও এলাইয়া পথের পানে চাইয়া থাকি। সে তখন পরের বাড়ির কাঁথা সিলাই করে, আর সে সুইচের ফোঁড় আমার বুকে আইয়া বিন্ধে'![১৩] এক সময় করম আলী এবং বন্দে আলী একমত হয়। তারা সমস্বরে বলে– 'আমরার জমি নাই, জিরাত নাই পরের জমি চইষা জান কাবার করি। যদি জমি থাকত তা অইলে বউরা নিজেরার ঘরে খাটত, তোমারে আমারে মুনিবের মত দেখাত'।[১৪]

করম আলীর বউ কাঁথা সেলাই করে। কিন্তু নিজে সে কাঁথা ব্যবহার করতে পারে না। সে সৌভাগ্য তাদের নেই। তাই করম আলী ছিঁড়া কাথা গায়ে দেয়। আর বন্দে আালী ছিঁড়া চাটাইয়ে ঘুমায়। অর্থাৎ ছিঁড়া কাঁথা ও ছিঁড়া চাটাই তাদের নিত্যসঙ্গী। লক্ষণীয় বিষয়–স্বামী-স্ত্রী দুজনই পরের বাড়িতে কাজ করে। তবু তাদের দুঃখ ঘোচে না। মুনিব হওয়ার সুপ্তবাসনা তারা হৃদয়ে পালন করে। কিন্তু করম আলী বন্দে আলীরা কোনদিন মুনিব হতে পারে না। পুরুষানুক্রমেই তারা অপরের বাড়িতে খেটে খায়। মাঠে কাজ করা হোক, আর তিতাসে মাছ ধরা হোক–তারা তো কাছাকাছিই থাকে। কেউ পানিতে, কেউ ডাঙ্গায়। সবার পরিচয় একই। তারা নিচুতলার মানুষ। এক অন্তহীন দুঃখবোধের সঙ্গে তাদের জীবন অক্টোপাসের মতো বাঁধা পড়ে।

তিন. সমাজচিত্রণ

মালোরা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বসবাস করে। তিতাসের এপার-ওপারে বাস করে। তাদের মধ্যকার সদ্ভাবটি বেশ চমৎকারই বলতে হয়। পারস্পরিক সৌজন্যবোধটি তারা পালন করে। চাষিরা নদীতীরবর্তী ভূমিতে কাজ করে। জেলেরা তিতাসে মাছ ধরে। পানি আর মাটি, মাটি আর পানি–এই তাদের জীবনজীবিকার উৎসক্ষেত্র। যাতায়াতের জন্য মালোরা নদীপথই ব্যবহার করে। এ উপন্যাসে মূলত মেয়েদের শ্বশুরবাড়ি-বাপেরবাড়ি যাতায়াতের দৃশ্যগুলো লেখক দেখিয়েছেন বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। মেয়েরা পর্দা করে। তবে সবক্ষেত্রে তা সমান নয়। বাপের বাড়ি এবং শ্বশুরবাড়িতে ভিন্নরকম পর্দাপ্রথা বিবাহিত মেয়েদের পালন করতে দেখা যায়। লেখক বলছেন–

> কোনটাতে ছই থাকে, কোনটাতে থাকে না। কোন কোন সময় ছইয়ের ভেতরে নয়া বউ থাকে। বাপের বাড়ি থেকে স্বামী তার বাড়িতে লইয়া যায়: তখন ছইয়ের এপারে থাকে বউয়েরই শাড়ি কাপড়ের বেড়া। স্বামীর বাড়ি থেকে যখন বাপের বাড়ি যায়, তখন কিন্তু কাপড়ের বেড়া থাকে না। থাকে না তার মাথায় ঘোমটা। ছইয়ের বাহিরে বসিয়া ঘাটগুলির দিকে চাহিয়া থাকে সে। স্বামীর বাড়ির ঘাট অদৃশ্য না হইলে কিন্তু সে ছইয়ের বাহিরে আসে না।[১৫]

বোঝা যায়, স্বামীর বাড়িতে যাওয়ার সময় মেয়েরা পর্দা প্রসঙ্গে অধিক সর্তক থাকত। কিন্তু এই পর্দাপ্রথা সবাই সমানভাবে পালন করে না। জেলেদের বউরা অনেকটা পর্দা ছাড়াই যাতায়াত করে এবং নিজেদের নৌকাতেই। এরা খুব বেশি সুন্দরী নয়। কিন্তু বামুন, কায়তের বউয়েরা পর্দায় ঘেরা দিয়ে যাতায়াত করে এবং এরা খুব সুন্দরী। এমন সুন্দরী বউ জেলের ছেলেরা পায়নি বলে কপালের দোষ দেয়। 'অমন সুন্দর বউ তাদের জীবনে কোনদিন আসিবে না। ভালো করিয়া চায় তারা। ভালো করিয়া চাইতে পারিলে প্রায়ই ছইয়ের ফাঁক দিয়া বাতাসে শাড়ি একটু সরিয়া গেলে, চকিতে তারই ফাঁক দিয়া, টুকটুকে একখানা মুখ আর এক জোড়া চোখ চোখে পড়িবে।'[১৬] এতে জেলে ছেলেদের বুকের ভেতর কেমন মায়া ও দুঃখবোধ তৈরি হয়।

মালোরা জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ-এই তিনটি উৎসব বেশ ঘটা করেই পালন করে। তবে পুত্র ও কন্যা সন্তানের মধ্যে বৈষম্য দেখা যায়। 'ছাইল হইলে পাঁচ ঝাড় জোকার, মাইয়া হইলে তিন ঝাড়'–এটি সমসাময়িক সমাজে প্রচলন ছিল। পঞ্জিকা দেখে দেখে নানা উৎসব-পার্বণ পালন করে। লেখক বর্ণনায়–

> ছয় দিনের দিন ঘরে দোয়াত কলম দেওয়া হইল। এই রাতে চিত্রগুপ্ত আসিয়া সে দোয়াত হইতে কালি তুলিয়া সেই কলমের সাহায্যে শিশুর কপালে লিখিয়া যায় তার ভাগ্যলিপি।[১৭]

এই প্রসঙ্গে গবেষক বলছেন-

> সুবিধা-বঞ্চিত মালোরা অবচেতনে সভ্য হবার অর্থ খোঁজে। তাই মনে মনে শিক্ষিত মানুষকে ঘৃণা করলেও শিক্ষিত হবার মূল্যও তারা বোঝে। অন্যদিকে ভাগ্য তাদেরকে প্রবঞ্চিত করলেও ভাগ্যকে তারা শিশুর কপালে কলমের আচড়েই ধারণ করে।[১৮]

মাঝে মাঝে দ্বন্দ্বও দেখা যায়। জমিদাররা প্রজাদের ওপর অত্যাচার করে। তাই পশ্চিমবঙ্গের কোনো এক গ্রাম থেকে উচ্ছেদ হওয়া জেলেরা এসে ঘর বেঁধেছে নয়াকান্দা গ্রামে। আবার কখনো কখনো পার্শ্ববর্তী দুই গ্রামের মধ্যে দ্বন্দ্বও লাগত। একবার শুকদেবপুর আর মালোদেবপুরের মধ্যে এরকম মারামারি হয়। লেখকের ভাষায়- 'শতশত কণ্ঠের শোরগোলের মধ্যে শতশত লাঠির ঠকাঠক ঠকাঠক শব্দ হইতে লাগিল। কারো হাত ভাঙ্গিল, পা ভাঙ্গিল, কারো মাথা ফাঁটিল। আক্রমণকারীদের অনেকেই আর ফিরিয়া গেল না। রক্তাক্ত দেহে এখানেই পড়িয়া থাকিল। অন্যেরা লাঠি ঘুরাইয়া পিছু হটিতে হটিতে খোলা মাঠে নামিয়া দৌড় দিল'।[১৯]

দ্বন্দ্ব-ফ্যাসাদের পাশাপাশি বন্ধু পাতানোও মালো সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। উজানিনগরের শুকদেবপুরের কোন এক অপরিচিতিজন কিশোরের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায়। কিশোরও সম্মত হয়ে বলে-'আচ্ছা, বন্ধুস্তি করলাম বেশ।' কিন্তু এভাবে কেবল মুখের কথায় তাদের বন্ধুত্ব হয় না। রীতিমতো বাজনা বাজাতে হয়, গামছা বদল করতে হয়। তাই আগন্তুকের মুখে শুনতে পাই–'মুখে-মুখে বন্ধুস্তি হয় না। বাদ্য-বাজনা বাজাইয়া কাপড়-গামছা বদল কইরা।'

ডাকাতির মতো নেতিবাচক চিত্রও এ উপন্যাসে দেখা যায়। কিশোর-তিলক-সুবল উজানিনগর থেকে নদীপথেই ফিরে আসে। সঙ্গে কিশোরের জীবনসঙ্গিনী নববধূটিও। হঠাৎ অভিজ্ঞ তিলকের মনে ডাকাতির সম্ভাবনা উঁকি দেয়। তিলকের সর্তকতামূলক পরামর্শ– 'ডাকাইতের মুল্লুক দিয়া নাও চালামু, তার মধ্যে আবার মাইয়ালোক। আমি কই, কিশোর, তুমি একখান কাম কর। পাটাতনের তলে বিছানা পাত। কেউ যেমুন না দেখে না জানে।'[২০] কিশোর যথাপরামর্শ কাজ করে এবং সতর্ক অবস্থায় থাকে। কিন্তু এত করেও সর্বনাশ ঠেকাতে পারেনি। তিলক ঘুম থেকে জেগে দেখে–

> ছইয়ের ভেতরে শুইয়াছিল, তারা তিনজনেই এখন ছইয়ের বাইরে। আর তিনজনেরই পা নৌকার গুরার সঙ্গে দড়ি দিয়া বাঁধা। নৌকা আর সেই খাড়ির ভেতর নাই। হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে নয়া গাঙের সেই সর্বনাশা মোহনার দিকে।[২১]

একটি বাক্সে বাণিজ্যের মুনাফা দুইশত টাকা ছিল। সেই বাক্স নেই। সবচেয়ে বড়ো ক্ষতি হয়ে গেছে কিশোরের। নববধূটিকেও পাওয়া যায়নি। ডাকাতরা অপহরণ করেছে। সেই থেকে কিশোর মানসিক ভারসাম্য হারালো। আর কোনোদিন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারেনি। ডাকাতরা এভাবে কিশোরের জীবনটাই তছনছ করে দেয়।

চার. সংস্কার-কুসংস্কার

তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসের চরিত্রগুলো শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। তারা দীর্ঘদিনের প্রচলপ্রথাকে বিশ্বাস করে আসছে গভীরভাবে। এই বিশ্বাস পেয়েছে তারা উত্তরাধিকারসূত্রে, বলা যায় অনেকটাই বংশপরম্পরায়। যৌক্তিকপন্থা তাদের কাছে অচেনা। এগুলোও সমাজজীবনেরই অংশ। কিশোর, সুবল আর তিলক যখন উজানিনগরে যাত্রা করে, তারা পাঁচপিরের ধ্বনি দিয়ে যাত্রা শুরু করে। তারা বিশ্বাস করে-এতে যাত্রা শুভ হবে। লেখক বর্ণনা করেছেন- 'পাঁচপির বদরের ধ্বনি দিয়া প্রথমে লগি ঠেলা দিল তিলক। সুবল হালের বৈঠা ধরিল। তার জোর টানে নৌকা সাপের মতো হিস হিস করিয়া ঢেউ তুলিয়া ভাঙ্গিয়া চলিল'।[২২] কিন্তু বেশি দূর চলল না। অচিরেই নৌকা আটকে গেল নদীর মাঝখানে। কিশোরের বুক কেঁপে উঠে। তবু সুবলকে ভরসা দিচ্ছে কিশোর এই বলে- 'না সুবলা, ডরাইসনা। গাঙের ডর মাইঝ গাঙে না, গাঙের বিপদ পারের কাছে। বা'র গাঙে মা গঙ্গা থাকে, বিপদে নাইয়ারে রক্ষা করে।'[২৩]

কিশোরের বিশ্বাস, মাঝগাঙে মা গঙ্গা থাকে। সেই বিপদ থেকে রক্ষা করবে। সুবল হালখানা হাতে নিয়ে সজোরে নৌকা সচল করতে গিয়ে আরও অচল হয়ে গেল। এবার

আতঙ্কিত কণ্ঠে তিলক বলে উঠে- 'আর আশা নাই সুবলা, কুমীরের দল নাও কান্ধে লইছে।'[২৪] রাতটুকু পোহালে সকালে দেখা গেল নৌকা চরে আটকে আছে।

নানা প্রকৃতির বিশ্বাসের বেড়াজালে বন্দি মালোসমাজ। এই জীবনাচার বহুদূর অবধি প্রসারিত। এমনকি অনন্তর মতো ছোট ছোট ছেলেরাও এর আওতাভুক্ত। অনন্তর মা মারা যায়। লোকের মুখে অনন্ত শুনেছে যে মৃতরা কাক হয়ে ফিরে আসে। তাই অনন্ত কাক দেখলেই খাবার দেয় আর কাকগুলোর ভেতরে কোনটি তার মা-তা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে। অনন্তর নিরীক্ষণ প্রসঙ্গে লেখক বলেন–

> যে কাকগুলি খাইতে আসে, একদৃষ্টে তাদের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখে–এর মধ্য কোনটা তার মা হইতে পারে। এখন আর মানুষ নয় বলিয়া কথা বলিতে পারে না, কিন্তু খাইতে খাইতে ঘাড় তুলিয়া চাহিয়া থাকে–বোধহয় এটাই তাহার মা। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকিতে চায় না, খাওয়া শেষ না করিয়াই এক ফাঁকে উড়িয়া যায়।[২৫]

পুরোহিত শ্রাদ্ধ শেষ করে টাকা নিয়ে চলে যায়। লবচন্দ্রের বউ, সুবলার বউ সব কাজে সহায়তা করে। লবচন্দ্রের বউয়ের পরামর্শমতে, অনন্ত মাকে সর্বশেষ খাবার দিয়ে আসে। মৃতমাকে খাবার দেওয়ার পদ্ধতি প্রসঙ্গে লবচন্দ্রের বউ বলে- 'না-জল না-শুকনা, এমুন জায়গায় রাইখ্যা পাছ ফিরা আইয়া পড়, আর পিছনের দিকে চাইস না। অনন্ত জন্মের মত মাকে শেষ খাবার দিয়া স্ত্রীলোকটির পিছুপিছু বাড়ি চলিয়া আসিল'।[২৬]

মাঝেমাঝে ঝড়বৃষ্টি হয়। প্রাকৃতিক এসব উৎপাত অনন্ত উপভোগ করে। কখনো রাতে কখনো দিনে। এমনই এক ঝড়ের দিনে অনন্ত বাইরে ছিল। কোন এক বাড়িতে আশ্রয় নেয়। তার পরিচিতি এক নারী অনন্তকে ঘরের বারান্দায় তুলে নেয়। ঝড় অনন্তর কাছে নতুন নয়, বরং ঝড়কে তার ভালোই লাগে। নতুন দেখল নারীরূপ আর তার অটল বিশ্বাস। ঝড়কে অভিশাপ দেওয়ার কায়দাটা অনন্তকে বিস্ময়ে ভরিয়ে তোলে। নারীর সেই অভিশাপের স্বরূপ লেখক তুলে ধরেছেন এভাবে–

> দোহাই রামের দোহাই লক্ষণের, দোহাই বাণ রাজার: দোহাই ত্রিশ কোটি দেবতার।'কিন্তু ঝড় নির্বিকার। দাম্ভিক আঙ্গুলি হেলনে ত্রিশ কোটি দেবতারে কাত করিয়া বহিয়াই চলিল। এবার তার গলার আওয়াজ কাঁপাইয়া অন্য অস্ত্র বাহির করিয়া দিল, 'এই ঘরে তোর ভাইগ্না বউ, ছুঁইসনা, ছুঁইসনা–এই ঘরে তোর ভাইগ্না বউ, ছুঁইসনা, ছুঁইসনা।'কিন্তু ঝড় এ বাধাও মানিল না। পাশব শক্তিতে বিক্রম দেখাইয়া প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘরটা কাঁপাইয়া দিয়া গেল। সে নারীও দমিবার নয়। এবার সুর সপ্তমে চড়াইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, 'যা বেটা যা, পাহাড়ে যা, পর্বতে যা, বড় বড় বিরিক্ষের সনে যুদ্ধ কইরা যা! এ আদেশ অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়াই বুঝিবা ঝড় একটু মন্দ হইয়া আসিল এবং ঝিমাইয়া ঝিমাইয়া এক সময় তারও দম বন্ধ হইয়া গেল।[২৭]

উদয়তারা, নয়নতারা আর আসমানতারা তিন বোন। অনেকদিন পর তারা একত্র হয়েছে। গল্প আর শাস্ত্রকাহিনি বলে তারা রাতটি কাটাতে চায়। কিন্তু ছোটবোনের চোখে রাজ্যের ঘুম। তাই বড় বোন মানত করে যাতে ঘুম চলে যায়। বড় বোনের সংলাপটি এরকম- 'উদয়তারা শিলোকের রাজা। শিলোক দেউক, আর আমরা মানতি করি–ঘুম তা হইলে পালাইব।'[২৮] দেখা যাচ্ছে–মানত করে এরা ঘুম তাড়াতে চায়।

বর্ণপ্রথা ও ছুৎমার্গের মতো সামাজিক কুসংস্কার কারো কারো মধ্যে প্রবলভাবেই ছিল। মালোপাড়ার বুরুজ এমনই একটি চরিত্র। খররৌদ্রতাপে পথশ্রান্ত হয়ে বুরুজ জল সন্ধান করে। ইতোমধ্যে একটি সুন্দর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাড়ি পেয়ে যায়। ব্রাহ্মণঘর মনে করে বুরুজ জলপ্রার্থনা করে। একটি সুন্দর মেয়ে জলহাতে বেরিয়ে আসে। জলপানে বুরুজ পরিতৃপ্ত হয়ে মেয়েটির জাত সম্পর্কে জানতে পারে যে সে গন্ধভুঁইমালী অর্থাৎ ছোটজাত। এতে বুরুজের জাতি নষ্ট হয়। লেখক বর্ণনায়-

> সে ছোট জাতের মেয়ে–আছাড় খাইয়া বুরুজে কান্দে, পিছাড় খাইয়া বুরুজে কান্দে, জাতি গেল ভুঁইমালিয়ার ঘরে। বুরুজের জাতি গিয়াছে। সে কি করিবে? না গেল প্রবাসে না গেল দেশে, ফিরিয়া যেখানে তাহার জাতি নষ্ট হইল, সেখানেই সে রহিয়া গেল, আর বলিয়া দিল–সঙ্গের যত সঙ্গীয়া ভাই, কইও খবর মা বাপের ঠাঁই, জাতি গেল ভুঁইমালিয়ার ঘরে।[২৯]

এটিও সমসাময়িক সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য-চিত্র। যা দ্বারা কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমসাময়িক সমাজের বাস্তব অবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে।

পাঁচ. সংস্কৃতি-কৃষ্টি-কালচার

মালোপাড়ার মালোদের নিজস্ব সংস্কৃতি আছে। দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য-প্রথাপদ্ধতির সঙ্গে তারা পরিচিত। বারো মাসে তেরো পার্বণে তারা মেতে ওঠে। মাঘ মাসের শেষে আসে মাঘণ্ডলের ব্রত। এটি কুমারীদের উৎসব নামে খ্যাত। মালোপাড়ার মেয়েরা দলবেঁধে দলেদলে মাঘমণ্ডলের পূজা করে। ব্রত শেষে কুমারী মেয়ে তিতাস নদীতে চৌয়ারি ভাসায়। সঙ্গে সঙ্গে ঢাকঢোল বাজে, নারীরা গীত গায়। বাসন্তীর বয়স এগার বছর। বাসন্তীও চৌয়ারি ভাসায়। কিশোর-সুবল চৌয়ারি ধরতে প্রতিযোগিতায় নামে। শেষে সুবল চৌয়ারি ধরে মাথায় তুলে দৌড় দেয়। একসময় দেখা যায়, এই সুবলের সঙ্গে সত্যি সত্যিই বাসন্তীর বিয়ে হয়।

মালোরা তিতাসের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। তারা সুখে-দুঃখে তিতাসের সঙ্গে থাকে। নিজেরা তিতাসকে প্রণাম করে; ভবিষ্যৎ-প্রজন্মকেও তা শিখিয়ে দেয়। সন্তান জন্মের পর তিতাসে স্নানযাত্রা করতে হয়। ছোটবউকে এই কাজটি করতে দেখা যায়। লেখক বলছেন–

> ছেলেকোলে ছোট বউকে মাঝখানে করিয়া গান গাহিতে গাহিতে নারীরা তিতাসের ঘাটে গেল। ছোট বউ তিতাসকে নিজে তিনবার প্রণাম করিল, ছেলেকেও তিনবার প্রণাম করাইল। এক অঞ্জলি জল লইয়া তার মাথা ধোয়াইল। শাড়ির আঁচল দিয়া মুছিয়া নদীকে আবার নমস্কার করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিল।[৩০]

মালোদের মধ্যে অনেকেই পান-তামাক খেতে অভ্যস্ত। ছেলেরা হুঁকাও খায়। একজন বানিয়ে দেয়, আরেকজন টান দেয়। গল্প-রসিকতায়ও তারা কম যায় না। কথায় কথায় ধাঁধা ধরে। এমনকি জামাই শাশুড়ি ধাঁধার সঙ্গে ভীষণ রসিকতায় মেতে ওঠে। শাশুড়ি পান সাজিয়ে জামাইকে খেতে দিত আর ধাঁধার আড়ালে রসিকতায় মেতে উঠতো। এ রকম একটি ধাঁধা– 'পান খাও রসিক জামাই কথা কও ঠারে, পানের জন্ম অইল কোন অবতারে। যদি না কইতে পারে পানের জন্মকথা, ছাগল হইয়া খাও শাওড়াগাছের পাতা।'[৩১]

পান, তামাক আর রসিকতার সঙ্গে সঙ্গে আবার কেউ কেউ গাঁজা খেতেও অভ্যস্ত। ভাগাভাগি করে খায় আর গান গায়। গান মালোদের জীবনে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। নানা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে তারা দলবদ্ধভাবে গায় গায়। দলগুলোর রাধার দল, কৃষ্ণের দল নামে সম্বোধন করা হয়। বোঝা যায়, তাদের গানের ভাববস্তু রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা। মাঝে মাঝে যে আধ্যাত্মিক ভাবনা আসে না-তাও নয়।

মালোরা কীর্তনভজনের প্রতি আন্তরিক। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা নিয়েই তারা কীর্তন করে। উদয়তারা-নয়নতারাদের বাড়িতে গল্পের আসর জমে ওঠে। অনন্ত এ বাড়িতেই আছে। সকালে ঘুম থেকে জেগেই কেউ একজন পথ দিয়ে মন্দিরা বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে যাচ্ছে। তার কণ্ঠে বাজে-'রাই জাগো গো, আমার ধনী জাগো গো/ বৃন্দাবন বিলাসিনী, রাই জাগো গো।' মাঝে মাঝে অতিথিরা বিভিন্ন জায়গা থেকে আসে। আসর গরম করে আবার বিদায় নেয়। এ এলাকার বনমালী তো আছেই। কবিগানের আসরে এই বনমালীই বলা যায় মধ্যমণি। বনমালীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়-'সোনার বরণ দুইটি শিশু ঝলমল ঝলমল করে গো / আমি দেইখে এলেম ভরতের বাজারে।'[৩২]

পুঁথিপাঠ মালোদের প্রিয় প্রসঙ্গ। নানা ধরনের পুরাণ পাঠ করা হয় বিশেষত পদ্মপুরাণ। বেহুলা-লখিন্দর, সখিনা, চাঁদ সওদাগরের কেচ্ছাকাহিনি মালোরা হৃদয় দিয়ে শ্রবণ করে।মনসার পূজার পরেও পদ্মপুরাণ পাঠ করা হয়। লেখকের ভাষায়–

> শ্রাবণের শেষ দিন পর্যন্ত পদ্মপুরাণ পড়া হয়, কিন্তু পুঁথি সমাপ্ত করা হয় না। লখিন্দরের পুনর্মিলন ও মনসা-বন্দনা বলিয়া শেষ দুইটি পরিচ্ছেদ রাখিয়া দেওয়া হয় এবং তাহা পড়া হয় মনসা পূজার পরের দিন সকালে, সেদিন মালোরা জাল বাহিতে যায় না। খুব করিয়া পদ্মপুরাণ গায় আর খোল করতাল বাজায়।[৩৩]

মালোরা অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির মানুষ। নিজেদের মধ্যে বর্ণপ্রথা কিছুটা থাকলেও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব বিরাজমান। তাই নদীতে কাদিরের আলুর নৌকা ডুবিতে গেলে বনমালী সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয়। কাদিরের আলু রক্ষা পায়, কাদির বিপুল ক্ষতির হাত থেকে বেঁচে যায়। সমালোচকের ভাষায়- প্রবল বর্ষণে কাদেরের আলুর নৌকা ডুবে যাওয়ার সময় বনমালীর সাহায্য প্রদানের চিত্র অংকনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এর যথার্থতা উপলব্ধি করা যায়। নদীকে লেখক এখানে মানুষের মিলনের ক্ষেত্রভূমি হিসেবেই ব্যবহার করেছেন।[৩৪]

অদ্বৈত মল্লবর্মণ সমগ্র সমাজকেই তুলে আনতে চেয়েছেন। মুসলিম সমাজ-সংস্কৃতি তার কাছে উপেক্ষিত নয়। তাদের একটিই পরিচয় তারা দলিতশ্রেণি। নিপীড়িত মানুষই নিপীড়িতের দুঃখ বোঝে। অদ্বৈত মল্লবর্মণের অসাম্প্রদায়িক চেতনা প্রসঙ্গে কথাসাহিত্যিক হরিশংকর জলদাস বলেন–

> হিন্দু-মুসলমান নিয়েই বাঙালি সমাজ। মালোজীবন আঁকতে গিয়ে অদ্বৈত তাঁর চারিদিকের সমাজকে ভুলেননি। মুসলমান সমাজ ও মুসলিম চরিত্র তাঁর উপন্যাসে উপেক্ষিত নয়। এই উপন্যাসে ছাদির-কাদির ছাড়াও একাধিক মুসলিম চরিত্র আছে। জমিলা, খুশী, রসু এবং মোক্তার ভদ্রলোকের মত গৃহস্থ মুসলমানের উল্লেখ আছে। আছে বন্দে আলী ও করম আলীর মত দলিত ভাগ্যহীন মুসলমানের কথা। এইসব দলিত

সাধারণ মুসলমানের মাধ্যমে অদ্বৈত জীবনবাস্তবতাকে নিখুঁতভাবে অঙ্কন করেছেন 'তিতাসে'।[৩৫]

নৌকা বাইচ মালোসমাজের একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক পরিচয়। ঔপন্যাসিক বলেছেন–

> নদীর তীরবর্তীর বাসিন্দা হওয়াতে মালোরা মাঝে মাঝেই নৌকা প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে। দুইপাশে দুই সারি লোক বৈঠা হাতে বসে। মাঝে কয়েকজন প্রবীণ লোক দাঁড়ায়। ঢাকঢোল বাজে। কখনো কখনো মারামারির লাঠিও ওঠে নৌকায়। ছাদিরের নৌকা ছাড়া প্রসঙ্গে লেখক বলছেন- আলীর নাম স্মরণ করিয়া তাহারা নৌকা খুলিল, শত শত বৈঠা একসঙ্গে উঠিল, পড়িল, জলের ওপর কুয়াশা সৃষ্টি করিল, তারপর তিতাসের বুক চিরিয়া যেন একখানা শিকারীর তীর হিসহিস করিয়া ছুটিয়া চলিল।[৩৬]

আবির খেলা মালোপাড়ার একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক উৎসব। এ উৎসবে সবাই মেতে ওঠে। বাসন্তী কাকে আবির দেবে। অনন্তকেই নির্বাচন করে। অনন্তকে আবির মেখে দিতে গিয়ে একটু লজ্জা পায়। কেননা, অনন্ত বড় হচ্ছে। হোলি উৎসব শুরু। সবার আড়ালে অনন্তর মা কিশোরকে আবির মাখাইয়া দেয়। কিশোরও এক সময় উত্তেজিত হয়ে ওঠে। অনন্তর মাকে পাজাকোল করে তুলে ধরে। বুকে দাঁড়িগোফসহ ঘষতে থাকে। অনন্তর মা মূর্ছা যায়। এবার পাগলামো করার অপরাধে জনতার পিটুনিতে কিশোর ভীষণভাবে আহত হয় এবং কয়েকদিন পরেই কিশোর মৃত্যুবরণ করে। চারদিন পর অনন্তর মাও পরপারে পাড়ি জমায়।

মালোদের সংস্কৃতি-কৃষ্টিকালচার প্রসঙ্গে অদ্বৈত মল্লবর্মণ বলেছেন-

> মালোদের নিজস্ব একটি সংস্কৃতি ছিল। গানে গল্পে প্রবাদে এবং লোকসাহিত্যের অন্যান্য মালমসলায় যে সংস্কৃতি ছিল অপূর্ব। পূজায় পার্বণে, হাসি ঠাট্টায় এবং দৈনন্দিন জীবনের আত্মপ্রকাশের ভাষাতে তাদের সংস্কৃতি ছিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। মালো ভিন্ন অপর কারো পক্ষে সে সংস্কৃতির ভিতরে প্রবেশ করার বা তার থেকে রস গ্রহণ করার পথ সুগম ছিল না। কারণ মালোদের সাহিত্য উপভোগ আর সকলের চাইতে স্বতন্ত্র। পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত তাদের গুণাবলি ভাবে যেমন মধুর, সুরেও তেমনি অন্তস্পর্শী। সে ভাবের, সে সুরের মর্ম গ্রহণ অপরের পক্ষে সুসাধ্য নয়। ইহাকে মালোরা প্রাণের সঙ্গে মিশাইয়া নিয়াছিল, কিন্তু অপরে দেখিত ইহাকে বিদ্রুপের দৃষ্টিতে। আজ কোথায় যেন তাদের সে সংস্কৃতিতে ভাঙন ধরিয়াছে। সেই গানে সেই সুরে প্রাণ ভরিয়া তান ধরিলে চিত্তের নিভৃতিতে ভাব যেন আর আগের মত দানা বাঁধিতে চায় না, কোথায় যেন কিসের একটা বজ্রদৃঢ় বন্ধন শ্লথ হইয়া খুলিয়া খুলিয়া যায়। যাত্রার দল যেন কঠোর কুঠারাঘাতে তার মূলটুকু কাটিয়া দিয়াছে।[৩৭]

উপন্যাসের চতুর্থ পর্বে 'দুরঙা প্রজাপতি' শব্দবন্ধ দ্বারা লেখক মালোসমাজের দুপ্রকৃতির দুধারার সংস্কৃতির প্রতি নির্দেশ করতে চেয়েছেন। একটি মালোসম্প্রদায়ের মূলধারার সংস্কৃতি। এরা কবিগান, শরিয়তি-মারফতি গান, রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা সম্পর্কিত আধ্যাত্মিক গান, দেহতত্ত্বের গান নিয়ে থাকে। বনমালী আর মোহন এ দলের প্রধান গায়ক। এরা গান শুরু করে এভাবে–'ভোমর কইও গিয়া, কালিয়ার বিচ্ছেদে রাধার অঙ্গ যায় জ্বলিয়া। না খায় অন্ন না লয় পানি, না বান্ধে মাথার কেশ, তুই শ্যামের বিহনে রাধার পাগলিনীর বেশ।' অপরদিকে রয়েছে নব্যধারা যাত্রা সংস্কৃতি। এরা কালোবরণের বাড়িতে আড্ডা জমায়। ওরা গানের সুর তোলে এভাবে–'সারারাতি মালা গাঁথি মুখে চুমু খাই রে, চিনির পানা মুখখানা তোর আহা মরে যাই রে।'

মালোরা একসময় ঐক্যবদ্ধ ছিল। যাত্রার দল পাড়ায় ঢুকে মালোদের মধ্যে ফাটল ধরে। সঙ্গে সঙ্গে মালোদের সংস্কৃতিও দুভাবে বিভক্ত হয়ে যায়। এটিকে লেখক 'দুরঙা প্রজাপতি' বলতে চেয়েছেন। একদিকে আছে মোহন, বনমালী, বাসন্তী রাধাকৃষ্ণ আর কবিয়াল নিয়ে। অন্যদিকে আছে কালোবরণরা নব্যযাত্রা গান নিয়ে। প্রথম দিকে বাসন্তী-বনমালীরা জিতে গেলেও পরিণামে হেরে যায়। শেষ পর্যন্ত হাতে গোণা দুচারজন ছাড়া প্রায় সবাই কালোবরণের আড্ডায় যোগ দেয়। এভাবে মালোদের সাংস্কৃতিক পরাজয় ঘটে। লেখক বলেছেন-

> মালোদের একতায় যেদিন ভাঙন ধরিল, সেইদিন হইতে তাদের দুঃসময়ের শুরু। এতদিন তাদের মধ্যে ঐক্য ছিল বজ্রের মত দৃঢ়; পাড়াতে তারা ছিল আঁটসাঁট সামাজিকতার সুদৃঢ় গাঁথুনির মধ্যে সংঘবদ্ধ। তাদের কেউ কিছু বলতে সাহস করে নাই। পাড়ার ভিতর যাত্রার দল ঢুকিয়া সেই ঐক্যে ফাটল ধরাইয়া দিল।[৩৮]

মালোদের এই পরাজয়কে গবেষক খোরশেদ আলম বলতে চেয়েছেন এভাবে–প্রবলের আধিপত্যে দুর্বলের অবসান–মালোজীবনেরও এ-সত্য প্রতিভাত।[৩৯] মালোরা তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হারিয়ে ভাসমান হয়ে বেঁচে থাকে। এটিই মালোজীবনের বড় ট্র্যাজেডি।

ছয়. উপসংহার

প্রত্যেক লেখকেরই কোনো না কোনো জীবনদর্শন থাকে। তিনি কিছু বলতে চান, কিছু করতে চান। তাই লেখনীকর্মে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। অদ্বৈত মল্লবর্মণেরও কিছু বলার আছে,কিছু করার আছে। এ দেশে যেমন ধনী আছে, তেমনিই গরিবও আছে। শাসন আছে, শোষণ আছে। নানা শ্রেণির, নানা পেশার নানা প্রকৃতির বঙ্গজন থাকলেও ঔপন্যাসিক চরিত্র হিসেবে নির্বাচন করেছেন সমাজের নিচুতলার মানুষকে। বাসন্তী, সুবল, কিশোর, তিলক, অনন্ত-এরাই অথবা এদের মতোই আরও অনেকে এ উপন্যাসের বয়ানকাঠামো পরিপুষ্ট করে। দিনের দুমুঠো খাবারের জন্য এদের সংগ্রাম করতে হয়। জমি নেই জমা নেই, সহায় নেই সম্পদ নেই। কেবল আছে জল। এ জলে চলার মতো নৌকাটুকুও নেই, জালও নেই। তাই অন্যের নৌকায় কাজ করে জীবনজীবিকা নির্বাহ করতে হয়। গগনচন্দ্র মালো সারা জীবনে সংগ্রাম করে একটি নৌকাও করতে পারে নি। নিজে না পারলেও পুত্র সুবল পারবে বলে বাসনা রাখে। কিন্তু কেউ পারে না, গগনও পারে না, পুত্র সুবলও পারে না। পিতা-পুত্র দুই পুরুষ পর্যায়ক্রমে ব্যর্থ হয়। প্রাণে বেঁচে থাকার জন্য যায় অন্যের নৌকায় কাজ করতে। শেষ পর্যন্ত সেই প্রাণটিই হারিয়ে যায়। এভাবে গগনচন্দ্র মালো, সুবল, কিশোররা হারিয়ে যায়। এই হারানো মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ানো দরকার। লেখকের দায়িত্বতো এটিই। এ প্রসঙ্গে কথাসাহিত্যিক শওকত আলীর মন্তব্যটি স্মরণযোগ্য। তিনি বলেন–

> লেখক নিজেকে সম্পর্কিত রাখবে শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে, কৃষাণের সঙ্গে, শ্রমিকের সঙ্গে। এ সম্পর্ক রাখা মহানুভবতা দেখানোর জন্য নয়, কিংবা অন্যের প্রতি কর্তব্য পালনের জন্যও নয়–এ সম্পর্ক রাখা লেখকের নিজেকে সৃজনশীল রাখবার জন্যই। কেননা শ্রমজীবী মানুষের মধ্যেই সমাজ রূপান্তরের বীজ উপ্ত হচ্ছে। সেখানেই পরিবর্তনের সূচনা ঘটছে। দিন বদলের হাওয়া সেখান থেকেই নতুন মোড় নিচ্ছে–এবং সেখানেই লেখককে থাকতে হবে, তার রচনার প্রাণরস সেখান থেকেই উঠে আসবে।[৪০]

ঔপন্যাসিক অদ্বৈত এটি বুঝতে পেরেছিলেন। তার লেখনীরসও সঞ্জীবিত হয়েছে মালোপাড়ার মালোদের বেদনার রসে। তিনি নিজেও এই প্রান্তিক মানুষই। জীবনাভিজ্ঞতায় দেখেছেন মালো সম্প্রদায়ের জীবনসংগ্রামের করুণ আলেখ্য। তাই তিনি নিজেই নিজের কথা লিপিবদ্ধ করতে চেয়েছেন। গবেষকের ভাষায়–

> সমকালীন যুগের ঔপন্যাসিকদের মত চরিত্রকে মায়াবী প্রেমের রঙতুলিতে আঁচড় দেয়াও তিনি সমীচীন মনে করেননি। তাঁর নিজস্ব জীবনের অভিজ্ঞতাই এ উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহকে সত্য করে তুলেছে। একটি জনগোষ্ঠীর জীবন-মরণই সেখানে মুখ্য। লেখক শুধু নিজে অমর হয়ে থাকেননি থেকেছে তাঁর তিতাসপাড়ের মানুষও। এটাই অদ্বৈত মল্লবর্মণের এ রচনার বিশেষত্ব।[৪১]

লেখক আরও একটি বড়ো কাজ করেছেন– প্রান্তসমাজের প্রান্তজনের সঙ্গে নিজের আত্মসংযোগ গড়ে তুলেছেন। তাই অদ্বৈতর লেখনীকর্ম এতটাই মর্মস্পর্শী, সেই সঙ্গে বাস্তবধর্মী। জীবন, সমাজ ও সংস্কৃতিকে তিনি শিল্পে রূপান্তর করেন। সাহিত্যের বাস্তবতা ও শিল্পীর দক্ষতা প্রসঙ্গে হাসান আজিজুল হক বলেন– 'দক্ষ কারিগরের হাতে এক টুকরো হীরে অসামান্য হয়ে ওঠে। হীরের হীরেত্ব পরিপূর্ণ ফুটে ওঠে, তার অসংখ্য তল দেখা দেয়, অন্ধকারের মধ্যে সে আলো বিচ্ছুরণের ক্ষমতা পেয়ে যায়'।[৪২]

অদ্বৈত মল্লবর্মণের সৃষ্টিকর্ম *তিতাস একটি নদীর* নাম উপন্যাসেও সমাজের তল দেখা যায়। অদ্বৈত এই তল দেখেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি পাঠককেও দেখিয়ে দেন। তিনি দেখিয়ে দেন কেন সুবল-কিশোররা কেন প্রবাসে যায়। অনন্তরা কীভাবে ঘাটেঘাটে ফেরে। গগনচন্দ্রের স্বপ্ন কীভাবে মরে যায়।মালোসম্প্রদায়ের সমাজ ও সংস্কৃতি কীভাবে প্রবলের প্রবল আঘাতে ভেঙে খানখান হয়ে যায়। এরমধ্যে কীভাবে বাসন্তীরা কী সংগ্রাম করেই না বেঁচে থাকে। সবকিছু মিলিয়ে প্রান্তজনের গহনকান্নার কথাকার অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও তাঁর সৃষ্টিকর্ম *তিতাস একটি নদীর নাম* বাংলা সাহিত্যে অমরতার আসন পেয়ে যায়।

সাত. আখ্যানবস্তুর পটভূমি,বিষয়ভাবনার গভীর বাস্তবতা, চরিত্র ও শ্রেণিচেতনা, তাদের সমাজ ও সংস্কৃতির স্বরূপ সন্ধানের নৈপুণ্যতা, ভাষিক বোধবুদ্ধি ও উপস্থাপনার নান্দনিকতা সার্বিক প্রসঙ্গ মিলিয়ে *তিতাস একটি নদীর নাম* নিঃসন্দেহে বাংলা কথাসাহিত্যে এক অনন্য শৈল্পিক সংযোজন।

তথ্যসূচি:

---

১ অদ্বৈত মল্লবর্মণ, *তিতাস একটি নদীর নাম* (ঢাকা: বুক ক্লাব, ২০১৩), পৃ. ৩৯ ।
২ অদ্বৈত মল্লবর্মণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০
৩ অদ্বৈত মল্লবর্মণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪
৪ অদ্বৈত মল্লবর্মণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

৫ অদ্বৈত মল্লবর্মণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪-৫৫
৬ অদ্বৈত মল্লবর্মণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১-১৩২
৭ অদ্বৈত মল্লবর্মণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬
৮ অদ্বৈত মল্লবর্মণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪
৯ অদ্বৈত মল্লবর্মণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮
১০ অদ্বৈত মল্লবর্মণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮
১১ অদ্বৈত মল্লবর্মণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯
১২ অদ্বৈত মল্লবর্মণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯
১৩ অদ্বৈত মল্লবর্মণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০
১৪ অদ্বৈত মল্লবর্মণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০
১৫ অদ্বৈত মল্লবর্মণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪
১৬ অদ্বৈত মল্লবর্মণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪
১৭ অদ্বৈত মল্লবর্মণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬
১৮ খোরশেদ আলম, *বাংলা উপন্যাস শিল্পিত কররেখা* (ঢাকা: বিশ্বসাহিত্য ভবন, ২০১৮), পৃ. ১০২
১৯ অদ্বৈত মল্লবর্মণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬-৭৭
২০ অদ্বৈত মল্লবর্মণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১
২১ অদ্বৈত মল্লবর্মণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫
২২ অদ্বৈত মল্লবর্মণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬
২৩ অদ্বৈত মল্লবর্মণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯
২৪ অদ্বৈত মল্লবর্মণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯
২৫ অদ্বৈত মল্লবর্মণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯
২৬ অদ্বৈত মল্লবর্মণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০
২৭ অদ্বৈত মল্লবর্মণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২
২৮ অদ্বৈত মল্লবর্মণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০
২৯ অদ্বৈত মল্লবর্মণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১
৩০ অদ্বৈত মল্লবর্মণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬
৩১ অদ্বৈত মল্লবর্মণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫
৩২ অদ্বৈত মল্লবর্মণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩
৩৩ অদ্বৈত মল্লবর্মণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮
৩৪ নাসিম মহিউদ্দিন, *প্রসঙ্গ কথাসাহিত্য* (ঢাকা: কাগজ প্রকাশন, ২০০৩), পৃ. ১৬৯
৩৫ হরিশংকর জলদাস, *বাংলা সাহিত্যের নানা অনুষঙ্গ* (ঢাকা: রোদেলা প্রকাশনী, ২০১২), পৃ. ১০৬
৩৬ অদ্বৈত মল্লবর্মণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩
৩৭ অদ্বৈত মল্লবর্মণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১
৩৮ অদ্বৈত মল্লবর্মণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮-২২৯
৩৯ খোরশেদ আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭
৪০ শওকত আলী, *শওকত আলীর প্রবন্ধ* (ঢাকা: শ্রাবণ প্রকাশনী, ২০১৭), পৃ. ১৪
৪১ খোরশেদ আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১
৪২ হাসান আজিজুল হক, নির্বাচিত হাসান আজিজুল হক (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৮), পৃ. ৫৪৯